বাংলাদেশের জনসংখ্যা

ইউনিট ১১

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। বর্তমানে দেশের লোকসংখ্যা ১১.৬ মিলিয়ন। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই ছোট পরিসরে এতো বিশাল আয়তনের জনসংখ্যা আজ দেশের 'এক নম্বর সমস্যা" হিসেবে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৫৭%।
১৯৬১ সাল হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির একটি তালিকা নিম্নে দেখানো হলো :

এক নজরে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ও হার

সন	জনসংখ্যা মিলিয়ন	জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইল	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১৯৫১	৪২.০০	৭৬১ জন	০.১২%
১৯৬১	৫০.৮৪	৯২১ "	২.১২%
১৯৭৪	৭১.৪৭	১২৮৬ "	২.৮৭%
১৯৮১	৯৬.০০	১৬১৭ "	২.৩৬%
১৯৯১	১০৮.০০	১৯৪৭ "	২.১৭%
১৯৯৩	১১১৪.০০	৮৭০ " (বর্গ কিঃ মিঃ)	

এই অনুচ্ছেদে আপনারা যা যা পড়বেন :

পাঠ ১ : ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ;
পাঠ ২ : কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ;
পাঠ ৩ : তত্ত্বসমূহের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও বৃদ্ধির কারণ ;
পাঠ ৪ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বিশ্লেষণ ;
পাঠ ৫ : জনাধিক্যের চাপ – অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের উপর।

পাঠ ১ : ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, বাংলাদেশে কি জনাধিক্য দেখা দিয়েছে? বা বাংলাদেশ কি অতি জনবহুল দেশ? প্রশ্নটি জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রচলিত দুটি তত্ত্বের মাপকাঠিতে আপনারা বিচার করতে পারেন। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে ঐ প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হলো :

ভূমিকা

ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) ছিলেন ইংল্যান্ডের একজন অর্থনীতিবিদ এবং ধর্মযাজক। তিনি সর্বপ্রথম জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন যেখানে জনসংখ্যা বিষয়ে তাঁর মতবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর মতবাদটিতে তিনি মোট ছয়বার পরিবর্তন এনে প্রকাশ করেন। তাঁর তত্ত্বের সর্বশেষ পরিমার্জিত সংস্করণ বের হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৭২ সালে। ম্যালথাস তাঁর তত্ত্বের জন্য ধর্মতাত্ত্বিক ও মার্কসবাদীদের দ্বারা ঘৃণিত হন। তবে জনসংখ্যা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ অদ্যাবধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- খাদ্য এবং জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্যমূলক তত্ত্ব দাঁড় করানো হয়েছে।
- খাদ্যের উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপকে রোধ করার উপায় বের করা হয়েছে।
- জন্মহার সীমিত রেখে মানুষ তার মৌলিক চাহিদাগুলো পাওয়ার উপায় বের করেছে।

বিষয়বস্তু

ম্যালথাস বলেন, খাদ্যের উৎপাদন অপেক্ষা জনসংখ্যা দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পায়। তার মতে খাদ্য বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে (Arithmetic rate) এবং নিয়ন্ত্রণ করা না হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (Geometric rate)। গাণিতিক এবং জ্যামিতিক হারে প্রবৃদ্ধির ধারা নিম্নে আপনাদের দেখানো হলো :

গাণিতিক হার : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬,৭, ৮ ইত্যাদি ;
জ্যামিতিক হার : ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি।

এখানে আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন যে, গাণিতিক হারের চেয়ে জ্যামিতিক হার দ্রুত গতিসম্পন্ন। জ্যামিতিক হার চক্রবৃদ্ধি সুদ ব্যবস্থার মতো। মূলধনের সুদও সময়মত মূলধনে পরিণত হয় এবং সেটার সুদও একাউন্টে হয় জমা। ঠিক তেমনি আজকের শিশুরাও আগামীতে বাবা-মা হবে এবং তাদের ঘরে আসবে আরো শিশু। নিয়ন্ত্রণ করা না হলে হয়তো জন্ম নেবে আরো অধিক সংখ্যায়।
এভাবে ম্যালথাস বলতে চান যে, জ্যামিতিক হার গাণিতিক হারকে অতিক্রম করে চলে। অর্থাৎ বার্ষিক জন্মহার বার্ষিক খাদ্য উৎপাদনকে অতিক্রম করে চলবে। তারপর তিনটি সম্ভাব্য অবস্থার সৃষ্টি হবে যার প্রতিটি অবস্থাই মৃত্যুহারকে দেবে বাড়িয়ে। এগুলো হলো : ক্ষুধা, ব্যাধি এবং যুদ্ধ। ম্যালথাসের মতে এগুলোই হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক নিরোধ (positive checks) ব্যবস্থা।

এই প্রাকৃতিক নিরোধ ব্যবস্থাগুলো জনসংখ্যাকে এমন একটা সংখ্যায় কমিয়ে আনবে যে জনসংখ্যা উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণের সঙ্গে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ম্যালথাস মনে করেন যে, মানুষ যৌন চাহিদা দ্বারা এমনই ভাবে চালিত যে, সে প্রজনন ক্ষমতানুযায়ী সন্তান জন্ম দেবার প্রবণতা দেখায়। তিনি প্রথম দিকে যুক্তি দেখাতেন যে, সব অবস্থাতেই মানুষের জন্মহার একই থাকবে এবং কেবল মৃত্যুর হারই জন্মহার প্রবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তিনি তখন মনে করেছিলেন যে মানুষ হয়তো স্বেচ্ছায় সন্তান জন্মদান করবে না বা জনসংখ্যা সীমিত করবে না। তিনি আরো বলেন যে, যদি খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পায়, তা হলে তা বরং আরো অধিক সন্তানের জীবনধারণে করবে সহায়তা। ফলে জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। এতে আবার পুনরায় খাদ্যের উপর চাপ পড়বে। পুনরায় দেখা দেবে খাদ্যের অভাব।

পরবর্তীতে ম্যালথাস পরিবর্তীত ও পরিমার্জিত তত্ত্বে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, জন্মহার সীমিত করে মানুষ ইচ্ছা করলে ক্ষুধা, ব্যাধি এবং যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। এজন্য তিনি প্রাকৃতিক নিরোধের পরিবর্তে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (preventive checks) গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি অবশ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জনসংখ্যাকে সীমিত করে এমন কোন পন্থাকে অনৈতিক বলে উল্লেখ করেন এবং এর পরিবর্তে জন্মহার হ্রাস করার ক্ষেত্রে বিলম্বে বিবাহ (late marriage) করাকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করেন।

সমালোচনা :

ম্যালথাসের এই তত্ত্বটি নানানভাবে সমালোচিত হয়েছে। নিম্নে আপনাদের সামনে তা তুলে ধরা হলো :

১. ম্যালথাস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে প্রাকৃতিক নিরোধ অর্থ্যাৎ ক্ষুধা, ব্যাধি এবং যুদ্ধ বৃদ্ধি পাবে। ম্যালথাসের সময় থেকে অদ্যাবধি এই তিনটি প্রাকৃতিক নিরোধ বাড়েনি। বরং ক্ষুধা ও ব্যাধি নিবারণে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

২. ম্যালথাসের সময়ে খাদ্যের অভাবে যে মৃত্যুহার ছিল তা আজ অনেক হ্রাস পেয়েছে। তিনি চিন্তাও করতে পারেনি খাদ্যের উৎপাদন এতোটা বৃদ্ধি পাবে। কেননা কৃষি উৎপাদন বিগত একশত বছরে ২/৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি পদ্ধতিতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান হার সম্পর্কে ম্যালথাস ভাবতেও পারেন নি।

৩. আধুনিক যুগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের এমন অনেক ব্যবস্থা আবিষ্কার হয়েছে, যা ম্যালথাসের জানা ছিলনা। অথচ প্রতিরোধমূলক এবং প্রতিকারমূলক জন্মনিয়ন্ত্রণের অনেক ব্যবস্থা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

৪. ম্যালথাস কেবল জনসংখ্যার সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের সম্পর্ক নিয়েই বেশী চিন্তা-ভাবনা করেছেন। অথচ, তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের নানাবিধ ব্যবহার সম্পর্কে তেমনি চিন্তা-ভাবনা করেননি। এটা চিন্তা করলে তিনি হয়তো বলতেন প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে বরং আরো জনশক্তি বা শ্রমের প্রয়োজন হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে তা হবে সহায়ক।

অনুশীলনী

১. আপনার কাছে ম্যালথাসের তত্ত্বের কোন্ অংশটি বর্তমান সময়োপযোগী মনে হয় না –

সারাংশ

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ম্যালথাসের তত্ত্বটি হলো একটি জন-বিকাশের তত্ত্ব। কারণ কোন একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে জনসংখ্যা কিভাবে বাড়ে এবং এই বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে প্রভাবিত করে তাই ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু। এ তত্ত্বে দেশের খাদ্য যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার সমস্যাটি আলোচিত হয়েছে বলে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিস্থিতি হল জনাধিক্যের প্রধান লক্ষণ। সর্বোপরি এ তত্ত্বের মধ্য দিয়ে আমরা ম্যালথাসকে একজন হতাশবাদী হিসেবে দেখতে পাই। কারণ তাঁর তাছে অধিক জনসংখ্যা মাত্রই মানবজাতির জন্য একদিকে ত্রাস এবং নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। কিন্তু তারপরও বর্তমানে বিশ্বে দারিদ্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুটা হলেও অনেকেই ম্যালথাসের তত্ত্বটি বিশ্বাস করছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরটির পার্শ্বে (✓) টিক চিহ্ন দিন।

১. ম্যালথাসের তত্ত্বের কোন্ পদ্ধতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়?
   ক. ২, ৪, ৮, ১০, ১৪ ইত্যাদি খ. ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি
   গ. ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি গ. ২, ৪, ৬, ৮ ১০ ইত্যাদি

২. ম্যালথাসের তত্ত্বের কোন্ পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়?
   ক. ১, ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি খ. ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি
   গ. ১, ৪, ৭, ৮, ১০ ইত্যাদি ঘ. ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি

৩. ম্যালথাসের মতে কি উপায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হবে?
   ক. মানুষের দ্বারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা
   খ. প্রাকৃতিক নিরোধ ব্যবস্থা
   গ. প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা
   ঘ. কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে

পাঠ ২ : কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব

ভূমিকা

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি নতুন তত্ত্ব প্রচার করন। এই তত্ত্বটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বা বাঞ্চনীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। কাম্য জনসংখ্যার চিন্তা গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর চিন্তায়ও লক্ষ করা যায়। তবে আধুনিক যুগে যুলিয়াস উলফ তত্ত্বটির যুক্তিভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

উদ্দেশ্য

- জনসংখ্যাকে কিভাবে সম্পদ ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে জানতে পারবেন ;
- জনসংখ্যার সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নে প্রক্রিয়া জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

এই তত্ত্ব অনুযায়ী, কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে লোকের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয় তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। কাম্য জনসংখ্যা দ্বারা এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝায় যা দেশের সব প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে সর্বাধিক উৎপাদন করতে পারে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. কাম্য জনসংখ্যা বলতে বুঝায় আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা। আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা সেটাই যে জনসংখ্যা কোন দেশের সম্পদক ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চয়তা দিতে পারে।

২. কাম্য জনসংখ্যার লক্ষ্য হলো সর্বাধিক উন্নতি বা সমৃদ্ধি আনয়ন। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে কাম্য জনসংখ্যা বলতে এমন এক জনসংখ্যার কথা বলা হয় যেখানে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক।

৩. কাম্য জনসংখ্যা বলতে বুঝায় এমন জনসংখ্যা যাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। অর্থাৎ, যে জনসংখ্যা জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটাতে এবং স্বচ্ছল জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানে সক্ষম সেটাই কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব।

৪. সমাজতাত্ত্বিকভাবে বলা যায়, কাম্য জনসংখ্যা বলতে এমন এক জনসংখ্যা বুঝায় যা কোন সমাজের কম অথবা বেশী জনসংখ্যার ত্রুটিমুক্ত এক "আদর্শ" জনসংখ্যা। একথা সহজেই অনুমেয় যে কোন সমাজের জনসংখ্যার সম্পদ ও সুযোগের তুলনায় কম হলে ঐ সম্পদ ও সুযোগের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য জনশক্তির অভাব দেখা দেবে। অপরপক্ষে সম্পদ ও সুযোগের তুলনায় অতিরিক্ত জনসংখ্যার অর্থ হলো ক্ষুধা ও ব্যাধিগ্রস্ত জনসংখ্যা।

কাম্য জনসংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করা যায় :

কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের অবশ্য সুক্ষ্ম মাপকাঠি নেই। তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিচার করা হয়। যথা :

১. কাম্য জনসংখ্যায় থাকবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

২. সম্পদ ও সুযোগকে কাজে লাগাতে জনশক্তির অভাব হবে না।

৩. উদ্যোমী এবং দীর্ঘায়ুসম্পন্ন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক জনসংখ্যা।
৪. সর্বাধিক আয় এবং উন্নত জীবনযাত্রা সম্পন্ন এক জনগোষ্ঠী।
৫. আধুনিক সভ্যতার সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম এমন জনসংখ্যা।

সমালোচনা :

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি ত্রুটিবিহীন না। নিম্নে এই তত্ত্বের সমালোচনাসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. তত্ত্বটি একটি আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যাকে নির্দেশ করে মাত্র, তবে তত্ত্বটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনমৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়না।

২. কাম্য বা আকাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা একটি অস্পষ্ট ধারণা। কেননা, সর্বাধিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সর্বাধিক আয়, উন্নত জীবনযাত্রা এ সবই আপেক্ষিক প্রত্যয়। কোন্ সমাজের তুলনায় কোন্ সমাজ সর্বাধিক আয় বা উন্নততর জীবনের নিশ্চয়তা দিয়ে তা কাম্য জনসংখ্যায় রূপ নেবে?
উন্নত জীবনের মাপকাঠিই বা কি? কোন্ পর্যায়ের উন্নত জীবন সমাজের কোন্ শ্রেণী আকাঙ্ক্ষা করবে? কাম্য জনসংখ্যার ধারণাটি তাই বেশ খানিকটা অস্পষ্ট।

৩. কোন দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সম্পদ ও সুযোগের প্রেক্ষিতে কোন্ জনসংখ্যাকে কাম্য বলে আখ্যা দেয়া হয়। কিন্তু কোন নতুন প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কারের ফলে এ সম্পদ ও সুযোগ বেড়ে যেতে পারে।

অনুশীলনী :

১. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে সমাজের কোন্ দিকটির প্রতি জোর দেয়া হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

সারাংশ

বস্তুত, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে মানবজাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে যে নৈরাশ্যমূলক ধারণা পাওয়া যায় কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে তা দূর করে এক নতুন আশার বাণী প্রচার করা হয়। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী যদি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে উৎপাদন বৃদ্ধিও চলতে থাকে তাহলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি পেলেও এতে আকাঙ্ক্ষার কিছু থাকবে না। এদিক দিয়ে বিচার করলে আধুনিককালে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি একটি আশাবাদী তত্ত্ব হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে কিভাবে সমাজকে দেখানো হয়েছে ?
   ক. সম্পদ এবং সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারকারী উন্ন সমাজ ;
   খ. জনসংখ্যা সমৃদ্ধশালী সমাজ ;
   গ. খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ ;
   ঘ. যে সমাজে জন্মহার মৃত্যুহার সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য কি?
   ক. অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা ;
   খ. জন্মহার-মৃত্যুহারকে কমিয়ে আনা ;
   গ. একটি উন্নত অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো তৈরী করা ;
   ঘ. জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা।

পাঠ ৩ : তত্ত্বসমূহের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য ও বৃদ্ধির কারণ

ভূমিকা

ম্যালথাস তত্ত্বের আলোকে খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে (১, ২, ৩, ৪, ...) এবং জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে (১, ২, ৪, ৮, ...) বৃদ্ধি পায়। ফলে, খাদ্যের ওপরে জনসংখ্যার চাপ অবশ্যাম্ভাবী। তাঁর মতে এর প্রতিকার বা প্রতিরোধ করা না গেলে প্রকৃতিই এর সমাধান দেবে। ম্যালথাসের এই তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশকে "অতি জনবহুল" দেশ বলে আমরা আখ্যায়িত করতে পারি।

অপরদিকে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, কোন দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে কোন জনসংখ্যাকেই অবশ্য অতিরিক্ত জনসংখ্যা বলা চলে না। এরই প্রেক্ষিতে আপাতদৃষ্টিতে যদিও বাংলাদেশকে কাম্য জনসংখ্যার দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি তারপরও দেশে বিদ্যমান দারিদ্র, বেকারত্ব বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে এটি কাম্য জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যে পড়ে না।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- ম্যালথাস ও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাঠামো তৈরী করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা কাঠামো তৈরীর মধ্য দিয়ে এর সমস্যা ও সমাধান বের করে আনতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ম্যালথাসের তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো :

ম্যালথাস তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা

১. বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। খাদ্য হার যেখানে ১% সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ২.২% হারে। এর ফলে প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতি দেখা যাচ্ছে এবং তা আশানুরূপ কমছে না।

২. ক্রমবর্ধমান হারে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কৃষি ভূমির উপর চাপ পড়ছে। ফলে পরিবার প্রতি বা মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন আপনারা সকলেই দেখবেন সরকারকে আর সিলিং করে পরিবার প্রতি জমির পরিমান কমিয়ে আনতে হবে না। কেননা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে এমনিতেই পরিবারের সব জমি উত্তরাধিকারীদের মধ্য ভাগ হতে হতে কমে আসছে।

৩. ম্যালথাসের তত্ত্বের আলোকে বলা যায় যে, যেহেতু বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যুহার বেশী তাই দেশটি অতি জনবহুল দেশই বটে।

৪. দেশে যে হারে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যে হারে দেশের সীমিত সুযোগ-সুবিধা এবং সীমিত উন্নয়নের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে উন্নয়নের সামান্য জর্জরিত ফল নিমিষেই শেষ হয়ে যাচ্ছে ও যেতে থাকবে।

৫. ম্যালথাস ভবিষ্যদ্বানী করে বলেছিলেন, কোন দেশে জনাধিক্য দেখা দিলে সে দেশ যদি তা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তবে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিবে যা হতো কিছুট জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। ম্যালথাসের এই ভবিষ্যদ্বানী বাংলাদেশে মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা

কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের আলোকে বিচার করে বাংলাদেশকে অনেকেই অতি জনবহুল দেশ বলতে চান না। এর কারণ হলো :

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেশী হলেও মৃত্যু সংখ্যা একেবারে কমে যায়নি। তাই জনসংখ্যা মৃত্যুর হার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রয়েছে বৈকি।

২. গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কিছূটা অন্তত বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিক দিন মজুরের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিপণ্যের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যদিও চাকুরীজিবীদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি দ্রব্যমূল্যের প্রেক্ষিতে তা বেশ কম।

৩. প্রায়ই বলা হচ্ছে যে, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের মওজুত যা আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ঐ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার শুরু না হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। তাই বাংলাদেশ অতি জনবহুল দেশ বলে আখ্যা পাবে না।

কিন্তু আসলে কি তাই? বস্তুত বাংলাদেশকে অতি জনবহুল দেশ না বলার কোনই কারণ নেই, কেননা –

১. দারিদ্র্য, জরা-ব্যাধি, পুষ্টিহীনতা, বেকার সমস্যা এবং সর্বোপরি জীবনযাত্রার নিম্নমান বিচারে এদেশকে অতি জনবহুল দেশ বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

২. যদিও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি ঐ আয়ের ক্রয় ক্ষমতা কি বেড়েছে? তাই প্রকৃত আয় বাড়েনি। উল্লেখ্য যে, আমাদের চাকুরিজীবিদের বেতন জাতীয় স্কেলে দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় স্কেলের বেতনের অর্থ দিয়ে আন্তর্জাতিক মূল্যেই আমরা প্রায় সবকিছু ক্রয় করছি। তাই জীবনযাত্রার মান নিম্ন।

৩. যে প্রাকৃতিক সম্পদের কথা বলা হচ্ছে তার প্রকৃত খতিয়ানই বা কোথায়? কিভাবে, কতদিনে তা ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যাবে, কত লোকের জন্যই বা তা যথেষ্ট হবে তার হিসাব আছে কি? বস্তুত, একটা কল্পনার ওপর নির্ভর করে বলা যায় না যে, বাংলাদেশ অতি জনবহুল নয়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

কোন দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ঐ দেশের ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকার উর্বরতা, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিল্পায়ন প্রভৃতি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার অধিক ঘনত্বের জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলো কম-বেশী দায়ী।

১. **ভূ-প্রকৃতি :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের মূলে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব যথেষ্ট। আমাদের দেশে অধিকাংশ ভূমি সমতল ও উর্বর। সমতল ভূমি চাষাবাদ, বাড়ি-ঘর নির্মাণ, যাতায়াত প্রভৃতিকেই সুবিধাজনক। এসব কারণেই এদেশে লোকবসতি ঘন।

২. **জলবায়ু :** জনসংখ্যার ঘনত্বের মূলে জলবায়ুর প্রভাব সর্বাধিক। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের আধিক্যের মূলে অনুকূল জলবায়ু কাজ করছে। আমাদের দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও মৃদুভাবাপন্ন। জলবায়ুর এই অবস্থা বসবাসের জন্য অধিক উপযোগী বলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী।

৩. **ভূমিক উর্বরতা :** ভূমির উর্বরতা কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত। ভূমির এই উর্বরতার উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে। যেহেতু উর্ধ্ব সমভূমি এলাকা জীবনযাপনের জন্য বেশী সুবিধাজনক। সুতরাং পদ্মা, মেঘনা, যমুনা প্রভৃতি নদীর অববাহিকায় উর্বর সমভূমিতে অতিরিক্ত লোক বাস করে থাকে। এ কারণেই বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী।

৪. **আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার, অথচ লোকসংখ্যা ১১.৬ কোটি। এতো অল্প সময়ে আয়তন বিশিষ্ট ভূখন্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই বেশী।

৫. **বৃষ্টিপাত :** বৃষ্টিপাত চাষাবাদকে সহজতর করে। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এই পরিমিত ও নিশ্চিত বৃষ্টিপাত বাংলাদেশের কৃষিকাজকে সহজ করে তুলেছে। এটাও বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের অন্যতম কারণ।

৬. **সেচ ব্যবস্থা :** বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ইরি প্রজেক্ট ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। ফলে এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী।

৭. **উচ্চ জন্মহার :** বাংলাদেশের আয়তন ও প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জন্মহার খুব বেশী। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এই ক্ষুদ্র আয়তনের ভূখন্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. **মৃত্যুহার কম :** বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ ও আধুনিক উন্নতমানের চিকিৎসার ফলে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে এবং মানুষের গড় আয়ুও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯. **শিল্পোন্নয়ন :** শিল্পে সমৃদ্ধ অঞ্চলে লোকবসতি ঘন হয়। কারণ সে অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে সে অঞ্চলে লোক বসতি ঘন হয়। তাই ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ জেলাগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশী।

১০. **যাতায়াতের সুবিধা :** উন্নতর সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে। বাংলাদেশের ভূমি সমতল বলে অতি অল্প সড়ক তৈরী করা যায়। তাছাড়া নদীপথে যোগাযোগ সহজ ও যাতায়াত খরচ কম। এইসব কারণে বাংলাদেশের সব জায়গাতেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী।

১১. **কৃষিকার্য :** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। খুব অল্প পরিশ্রমে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয় বলে তারা সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বৃদ্ধিতে নিরুৎসাহ হয় না। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুশীলনী :

১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার জন্য কোন্ তত্ত্বটি বেশী কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করেন?

২. বাংলাদেশকে কিভাবে আপনি অধিক জনবহুল দেশ হিসেবে চিহ্নিত করবেন?

সারাংশ

প্রায় ১২ কোটি জনসংখ্যার এই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিকার দিক দিয়ে একেবারে নুয়ে পড়েছে। বর্তমানে ১.৫৭% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে গবেষণায় দেখা গেছে ২০১৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম সারির দশটি মেগাসিটির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এই ভয়াবহ ভবিষ্যতকে সামনে রেখেও এখন পর্যন্ত জন্মহারকে কিছুটা হ্রাস করানো ছাড়া আর কোন ফলপ্রসু পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান হারে দরিদ্রতা ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান, খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্ব ইত্যাদি নানারকম সমস্যার পেছনে আছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এসব কারণেই জনসংখ্যা সমস্যাকে আমাদের দেশে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. আপনার মতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন্ কারণটি বেশী প্রকট বলে মনে হয় –

ক. উচ্চ জন্মহার　　খ. ভূ-প্রকৃতি

গ. ভূমিকা উর্বরতা　　ঘ. কৃষিকাজ

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যার কোন্ বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে –

ক. জনসংখ্যার তুলনায় ভৌগোলিক আয়তন ছোট

খ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মৃত্যুর হারের চেয়ে বেশী

গ. শহর এবং গ্রামের জনসংখ্যার পরিমাণের অসামঞ্জস্যতা

ঘ. অধিক জনসংখ্যার এই দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বিশ্লেষণ

ভূমিকা

যে কোন দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর উহার প্রভাব আলোচনা করতে হলে সেই দেশের জনসংখ্যার গঠন প্রকৃতির এবং উহার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতির সার্বিক তথ্য জানতে পারবেন ;
- জনসংখ্যার কাঠামোর সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনা করতে পারবেন ;
- সর্বোপরি, সার্বিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নিম্নে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন ও কাঠামোগত বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো :

১. **জনসংখ্যার আয়তন :** বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন হলো ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে তা পৃথিবীর মোট ভূখন্ডের ৩০০০ ভাগের মাত্র একভাগ অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ এশিয়ার পঞ্চম এবং পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। ১৯৯৩ সালের আদমশুমারীতে দেশের লোকসংখ্যা ১১.৬ কোটি এবং বৃদ্ধির হার বার্ষিক ১.৫৭। এই হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী ২০১৫ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের অপর ১০টি মেগাসিটির একটি অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. **স্ত্রী ও পুরুষ হিসেবে জনসংখ্যার বন্টন :** বাংলাদেশ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ লোকের সংখ্যা বেশী। বাংলাদেশে মহিলা ও পুরুষের অনুপাত ১০০ : ১০৬ ; অর্থাৎ ১০০ জন মহিলার স্থলে ১০৬ জন পুরুষ আছে। বাংলাদেশে মহিলার সংখ্যা কম হওয়ার প্রধান কারণ হলো নারীর অধিক মৃত্যু হার। নিম্নে মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা হিসেবে জনসংখ্যা বন্টনের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

তালিকা : নারী ও পুরুষের সংখ্যা

সাল	পুরুষ	নারী	মোট জনসংখ্যা
১৯৬১	২,৬৩,৪৮,৮৪৩	২,৪৪,৯১,৩৯২	৫,০৮,৪০,২৩৫
১৯৭৪	৩,৭০,৭১,৭৪০	৩,৪৪,০৭,৩৩১	৭,১৪,৭৯,০৭১
১৯৮১	৪,৬২,৯৫,০০০	৪,৩৬,১৭,০০০	৮,৯৯,১২,০০০
১৯৯১	৫,৫৫,৭৯,০০৩	৫,২৪,১৩,৯৩৭	১০,৭৯,৯২,৯৪০

৩. **গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা বন্টন :** কোন দেশের গ্রাম ও শহর অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা বন্টনের চিত্র হতে সেই দেশের অর্থনৈতিক মান নির্ণয় করা যায়। সাধারণত উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশ সমূহে মোট জনসংখ্যার বেশীর ভাগই শহরে বাস করে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, প্রভৃতি দেশে শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ লোক শহরে বাস করে। পক্ষান্তরে ভারত, মায়ানমার, বাংলাদেশের মতো প্রভৃতি অনুন্নত ও কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে মাত্র ২২ ভাগ লোক শহরে বাস করে। বর্তমানে বাংলাদেশের বড় বড় বিভাগীয় শহরগুলোতে অস্বাভাবিক জনাধিক্য লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ২০০০ সাল নাগাদ ঢাকা শহর মেগাসিটি অর্থাৎ এর লোক সংখ্যা ১০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে।

তালিকা : গ্রাম ও শহরের মধ্যে জনসংখ্যা বন্টন

বৎসর	গ্রাম	শহর	মোট
১৯৬১	৯৪.৮%	৫.২%	১০০.০০
১৯৭৪	৯১.২%	৮.৮%	১০০.০০
১৯৮১	৮৪.৮%	১৫.২%	১০০.০০

৪. **বয়স অনুপাতে জনসংখ্যার বন্টন :** কোন দেশের উৎপাদন ক্ষমতা সেই দেশের কর্মক্ষম লোকের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বয়স অনুসারে লোকের শ্রেণীবিভাগের ফলে দেশের মোট জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির অনুপাত জানা যায়। সাধারণত অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কাজ করতে পারে না বলে তাদেরকে শ্রমশক্তির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। আমাদের দেশে ১৫ বৎসরের নীচে ছেলেমেয়ে এবং ৬০ বৎসরের উর্ধ্বে বয়স্ক ব্যক্তিরা উপার্জনক্ষম নহে। এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার এই শ্রেণীই প্রায় অর্ধেকেরও বেশী যাদের পরনির্ভরশীল বলে তুলনা করা হয়।

তালিকা : বয়স অনুসারে লোকসংখ্যা বন্টন

বয়স	১৯৬১ (শতকরা হার)	১৯৭৪ (শতকরা হার)	১৯৮০ (শতকরা হার)
০ – ১৪	৪৫.৮	৪৭.৫	৪৬.৫
১৫ – ৫৯	৪৮.৫	৪৬.৩	৪৭.৪
৬০ – তদুর্ধ্ব	৫.৭	৬.২	৬.১
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০

৫. **পেশাগতভাবে জনসংখ্যা বন্টন :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার $\frac{১}{৩}$ অংশ বিভিন্ন উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত আছে এবং বাকী $\frac{২}{৩}$ অংশ অন্যের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ৩৮.৭ ভাগ শিল্প, ব্যবসা, চাকুরী ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত আছে।

তালিকা : পেশাগত বন্টন (শতকরা হার)

বৎসর	কৃষি শ্রমশক্তি (শতকরা)	অ-কৃষি শ্রমশক্তি (শতকরা)	মোট
১৯৬১	৮৩.০	১৭.০	১০০.০
১৯৭৪	৭৭.০	২৩.০	১০০.০
১৯৮১	৬১.৩	৩৮.৭	১০০.০

৬. **ধর্মের ভিত্তিতে :** বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। এদেশে শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান। এছাড়া হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের লোকও কিছু কিছু বাস করে।

তালিকা : ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বন্টনের শতকরা হার

বৎসর	মুসলমান	হিন্দু	বৌদ্ধ	খৃষ্টান	অন্যান্য
১৯৬১	৮০.৪	১৮.৫	০.৭	০.৩	০.১
১৯৭৪	৮৫.৪	১৩.৫	০.৬	০.৩	০.২
১৯৮১	৮৬.৬	১২.১	০.৬	০.৩	০.৪

৭. **জন্মহার ও মৃত্যুহার :** বাংলাদেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশী। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি হাজারে জন্মহার হলো ৩৫ জন এবং প্রতি হাজারে মৃত্যুহার হলো ১৩ জন। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে এই তুলনায় জন্মহার ও মৃত্যুহার খুবই কম। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জন্মহার ও মৃত্যুহারের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

তালিকা : জন্মহার, মৃত্যুহার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

দেশ	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা)
যুক্তরাষ্ট্র	১৫	৯	০.৬
কানাডা	১৬	৭	০.৯
জাপান	১৪	৬	০.৮
অষ্ট্রেলিয়া	১৫	৭	০.৮
ফ্রান্স	১৫	১০	০.৫
ভারত	৩৪	১৪	২.০
নেপাল	৪৪	২০	২.৪
বাংলাদেশ	৩৫	১৩	২.২

৮. **শিক্ষিতের হার :** বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার খুবই কম। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। ১৯৯৩ সালের জরিপে বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার শতকরা ৩২ জন।

তালিকা

দেশ	শিক্ষিতের হার (শতকরা)	দেশ	শিক্ষিতের হার (শতকরা)
যুক্তরাষ্ট্র	৯৮	শ্রীলংকা	১০০
যুক্তরাজ্য	৯৯	মায়ানমার	৬০
জাপান	৯৮	ভারত	৩৬
ফ্রান্স	৯৭	বাংলাদেশ	৩২

৯. **নির্ভরশীলতার হার :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার নির্ভরশীলতার হার অনেক বেশী। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী পরনির্ভরশীল বা অনুৎপাদনশীল।

তালিকা

দেশ	নির্ভরশীলের হার (শতকরা)	দেশ	নির্ভরশীলের হার (শতকরা)
যুক্তরাষ্ট্র	৩৫	ভারত	৪৩
যুক্তরাজ্য	৩৭	মায়ানমার	৪৪
জাপান	৩২	পাকিস্তান	৪৯
কানাডা	৩৪	বাংলাদেশ	৫২

অনুশীলনী :

১. বাংলাদেশে স্ত্রী-পুরুষ হিসেবে জনসংখ্যার বন্টন কি ধরনের? গ্রাম শহরের মধ্যে এ বন্টনের কোন ভিন্নতা দেখা যায় কি?

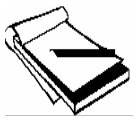

সারাংশ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন-প্রকৃতি ও কাঠামোগত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এটি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে। ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় আমাদের দেশের লোকসংখ্যা যেমন বেশী তেমনি গুণগত দিক থেকেও এদেশের জনশক্তির দক্ষতা নিম্নমানের। সুতরাং, বাংলাদেশের জনসংখ্যার গঠন-প্রকৃতি ও গুণগত মান নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে বিভিন্নভাবে ব্যাহত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নে সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. সাম্প্রতিক জরিপের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত –

ক. ২.২%　　খ. ১.৫৭%

গ. ২.১০%　　ঘ. ১.৮৫%

২. ঢাকা শহর কত সাল নাগাদ বিশ্বের মেগাসিটিগুলোর অন্যতম হবে –

ক. ২০১০ সাল　　খ. ২০১৫ সাল

গ. ২০০০ সাল　　ঘ. ২০০৫ সাল

৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যার কোন্ অংশ শ্রমশক্তি হিসেবে বেশী ভূমিকা রাখে –

ক. পুরুষ শ্রমশক্তি

খ. নারী শ্রমশক্তি

গ. সক্ষম ও প্রাপ্ত বয়স্ক আত্মনির্ভরশীল শ্রমশক্তি

ঘ. মুসলমান শ্রমশক্তি

৪. জনসংখ্যার কাঠামোগত দিক থেকে বিশ্বের কোন্ দেশটি সর্বাপেক্ষা উন্নত –

ক. যুক্তরাষ্ট্র　　খ. যুক্তরাজ্য

গ. কানাডা　　ঘ. অষ্ট্রেলিয়া

পাঠ ৫ : জনাধিক্যের চাপ — অন্নবস্ত্র, শিক্ষা চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের উপর

ভূমিকা :

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট অবস্থা জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। একদিকে স্বল্প আয়তনের ভূখন্ডে প্রায় ১২ কোটি জনসংখ্যার চাপ, অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এই দেশে মানুষ তার মৌলিক চাহিদা অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। মানুষ নিজের সৃষ্ট সমস্যাতে নিজেই সমস্যার বেড়াজালে জড়িয়ে গেছে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার স্বরূপ জানতে পারবেন।
- মৌলিক চাহিদাগুলোর প্রাপ্তির সমস্যা জেনে তা পূরণের উপায় জানতে পারবেন।
- এর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা প্রাপ্তির পরিস্থিতি জানতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যার চাপে বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশের সার্বিক মৌলিক চাহিদার অবস্থা নিম্নে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো :

১. খাদ্য :

বর্তমানে বাংলাদেশে জনাধিক্যের ফলে প্রথম এবং প্রধান যে সমস্যা প্রকট হয়ে আছে তা হলো দেশের লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি। অধিক জনসংখ্যার কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যদ্রব্যের অসমবন্টন প্রভৃতি কারণেই বাংলাদেশের এই খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলী পর্যালোচনা করলে খাদ্যের মতো এই মৌলিক চাহিদার বর্তমান অবস্থার ভয়াবহতা আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৯৮১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষাবাদযোগ্য ভূমির গড় পরিমাণ ০.৩৮ একর, ১৯৯১ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাড়ায় ০.১৯ একর। অর্থনীতিবিদদের মতে মাথাপিছু ন্যূনতম খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন গড়ে ১.৬৮ একর হতে ২ একর চাষাবাদযোগ্য ভূমি। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে একজন লোকের ন্যূনতম স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দৈনিক ২৫ আউন্স খাদ্যের প্রয়োজন। অথচ বাংলাদেশে গড়ে মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ মাত্র ১৫ আউন্স। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী আমাদের ২৩ লাখ ৭০ হাজার নতুন জনসংখ্যা সংযোজিত হয় তাদের জন্য বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজন ৩ লাখ ৫০ হাজার টন।

উপরোক্ত তথ্যাবলী হতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতির শেষ নেই। শুধুমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তন হয় না, খাদ্যের গুণগতমানও বাংলাদেশে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে যেখানে ৩০০০ ক্যালরি শক্তিকে ন্যূনতম দৈনিক প্রয়োজন হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেখানে এদেশের গ্রামবাংলার যে কোন আয়ের লোকদের পক্ষের ৩০০ ক্যালরি শক্তি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

১৯৮১-৮২ সালের জাতীয় পুষ্টি জরিপের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা ৭৬টি পরিবারই প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয়ে সক্ষম।

প্রভাব :

খাদ্যের মতো মৌল চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্টি হয় পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, শিল্পায়নের মন্থর গতি ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়। খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। ফলে অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না। উৎপাদন ক্ষেত্রে খাদ্য ঘাটতির প্রভাব নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

খাদ্য ঘাটতির প্রভাব

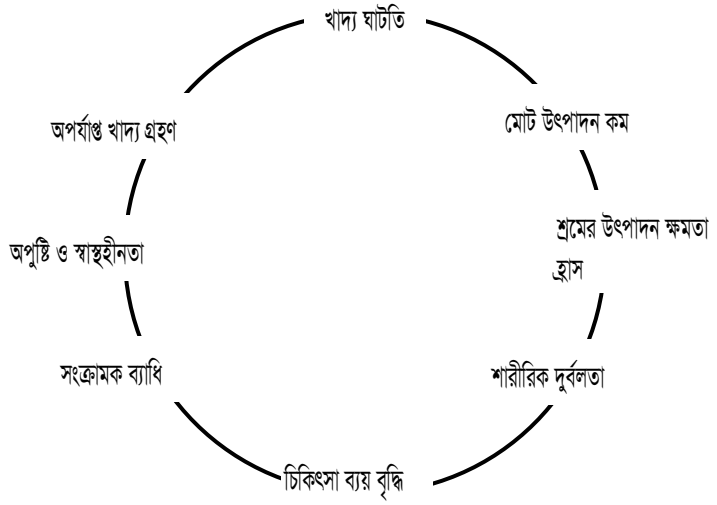

[উৎস : বাংলাদেশের অর্থনীতি : উন্নয়ন সমস্যা ও সমাধান – মোঃ আযম আজাদ]

২. বস্ত্র :

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সামাজিকতা রক্ষা এবং প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। অধিক জনসংখ্যার চাপে আজও বাংলাদেশ বস্ত্রের মৌলিক সরবরাহ নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রয়োজন মেটাতেই মাথাপিছু আয়ের ৭৫% ভাগ ব্যয় করা হয় এবং বস্ত্রখাতে ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ১০% ভাগ। মাথাপিছু বার্ষিক গড়ে ১০ মিটার কাপড়ের ব্যবহার ধরা হলে জনসংখ্যা অনুযায়ী বর্তমানে ১০০ মিটার কাপড়ের প্রয়োজন।

বার্ষিক মাথাপিছু কাপড়ের গড় ব্যবহার

সন	নতুন কাপড়/মিটার	পুরাতন কাপড়/মিটার
১৯৮৫/৯৬	৯.১	২.৭
১৯৮৬/৮৭	৮.১	১.৮
১৯৮৭/৮৮	৯.৩	১.০
১৯৮৮/৮৯	৯.৯	০.২
১৯৮৯/৯০	১০.৫	০.৩

[BBS. 1992P-308]

উপরোক্ত তথ্য হতে বাংলাদেশে বস্ত্র সমস্যার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। এটি একটি সমষ্টিগত অবস্থার ব্যাখ্যা। যদি ব্যাষ্টিক পর্যায়ে বস্ত্রের বাস্তব অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে আরো হতাশাজনক চিত্র পাওয়া যাবে। বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ পুরাতন কাপড় বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে। যদিও আমাদের দেশে বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে তারপরও অধিক জনসংখ্যার জন্য এটি তেমন কিছুই না।

৩. শিক্ষা :

শিক্ষা মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম কৌশল। শিক্ষা ব্যতীত মানুষ অন্যান্য মৌল চাহিদা পূরণের দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়না। বাংলাদেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী এদেশে শিক্ষিতের শতকরা হার ২৪.৮২ ভাগ। আদমশুমারীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে সাত বছর বয়েসের উপরের জনসংখ্যার শতকরা ৩২.৪ ভাগ শিক্ষিত বলে দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে শহরে ৫৭ ভাগ এবং গ্রামে ২৮ ভাগ শিক্ষিত। বাংলাদেশে প্রতি বছর যে হারে স্কুল উপযোগী শিশু কিশোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ হতে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।

১৯৯১ সালের আদমশুমারীর চূড়ান্ত রিপোর্টের আলোকে বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির তথ্যাদি নিম্নে দেয়া হলো :

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৭৯ লাখ শিশুর জন্য প্রয়োজন।
খ. প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন পৌনে দুই কোটি শিশুর জন্য।
গ. নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজন ৮০ লাখ শিশুর জন্য।
ঘ. মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি প্রয়োজন ৪৫ লাখ কিশোর-কিশোরীর জন্য।

প্রভাব :

বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় নিরক্ষরতার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া প্রচলিত কর্মবিমুখ শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহের অভাব নিরক্ষতার হারকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করছে। ফলে আমাদের দেশের নিরক্ষর, অজ্ঞ, অদক্ষ জনশক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণে সক্ষম হচ্ছে না। ব্যক্তি জীবনেও এসব নিরক্ষর লোক প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছেনা। ফলে তারা ন্যূনতম জীবনমান অর্জনে ব্যর্থ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

৪. চিকিৎসা :

চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থা কোনভাবেই জনসংখ্যার সঠিকভাবে সাহায্যে আসতে পারছে না। কারণ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় দিন দিন মানুষের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে। নিম্নে চিকিৎসাখাতে ১৯৯২ সালে সরকার কর্তৃক ব্যবস্থার একটি চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরা হলো :

সন	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১
মোট হাসপাতাল	৮৭৫	৮৭৫	৮৯০
সরকারী হাসপাতাল	৬০৮	৬০৮	৬১০
বেসরকী হাসপাতাল	২৬৭	২৬৭	২৮০
মোট হাসপাতালের শয্যা	৩৩,৩৭৬	৩৩,৩৭৬	৩৪,৩৫৩
রেজিষ্ট্রার্ড ডাক্তার	১৮,৩২৩	১৯,৩৮৭	২১,০০৪
ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত	১ : ৫৭৫৭	১ : ৫৫৪৩	১ : ৫২১৬
হাসপাতাল বেড ও জনসংখ্যার অনুপাত	১ : ৩১৬১	১ : ৫৫৪৩	১ : ৫২১৬
গড় আয়ুষ্কাল	৫৬ বছর	৫৬ বছর	৫৬ বছর
প্রতি হাজারে অশোধিত শিশু জন্মের হার	৩৩	৩২.৮	৩১.৬
প্রতি হাজারে অশোধিত শিশু মৃত্যুর হার	১১.৪	১১.৩	১১.০
প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার	৯৮	৯৪	৯১
মাথাপিছু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে সরকারী ব্যয় –	৬০ টাকা	৫৪ টাকা	৭৬ টাকা

৫. বাসস্থান :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ফলে গ্রামীন জনগণের শহরমুখী প্রবণতার প্রেক্ষিতে বর্তমানে আমাদের দেশের গ্রাম ও শহর এলাকায় বাসস্থান সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। বর্তমানে এটি একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তরের তথ্য অনুসারে বার্ষিক সংযোজিত নতুন জনসংখ্যার জন্য প্রতি বছর ২ লক্ষ ৬১ হাজার নতুন বাসগৃহের প্রয়োজন। যা নির্মাণ করা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে সম্ভব না।

১৯৭৯ সালের Land Occupancy Survey–এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা ৭৩.৫৭% ভাগের বসতবাড়ির ভূমির পরিমাণ মাত্র শূন্য থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে। ১৯৭৯ সালের বাংলাদেশ গৃহ গবেষণা ইনষ্টিটিউটের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের বাসস্থান সমস্যার নিম্নের চিত্র পাওয়া যায় :

বাসগৃহের ধরণ	পাকা	আধাপাকা	কাঁচা	ঝুপড়ি
শহর	১৯%	২৬%	৩৭%	৬%
গ্রাম	২.৫%	১৭.৫%	৮০%	৮০%

গ্রামীণ জনগণের শতকরা ৭ জন অন্যের বাড়িতে এবং ২২.৬% জন জ্বরাজীর্ণ বাসগৃহে মানবেতর জীবনযাপন করছে। শহুরে জনসংখ্যার ৮% বস্তীতে মানবেতর পরিবেশে বসবাস করছে।

[উৎস : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বাংলাদেশ সরকারী পরিকল্পনা কমিশন, জুন, ১৯৭৯ – পৃঃ ৫৪]

জাতিসংঘের তথ্যকেন্দ্র (ইউনিক) গৃহহীনদের জন্য আশ্রয় বর্ষ উদযাপনে আয়োজিত সেমিনারে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ১০ লক্ষ লোকের বাস করার আশ্রয় নেই, ৯৪ লক্ষ ঘরবাড়ি

মাটি ও বাঁশের তৈরী,শতকরা ৪৪ ভাগ নদী, ডোবা, পুকুর ও খালের পানি ব্যবহার করে। ৪৯ শতাংশ বাড়িতে পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই।
১৯৮৩/৮৪ সালের কৃষিশুমারীর তথ্যানুযায়ী দেশের শতকরা ৯ ভাগ পরিবারের চাষাবাদ ও বসতভিটার জমি ছিল না। ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের হিসাব অনুযায়ী ঢাকার বস্তিতে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক মানবেতর জীবন যাপন করছে।
তাছাড়া প্রতি বছর ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীর ভাঙ্গা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে।

৬. কর্মসংস্থান :

জনাধিক্যের কারণে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল দেশের অপ্রতুল কর্মসংস্থানের সুবিধা। আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন, প্রতিবছর নতুন কর্ম তেমন সৃষ্টি হচ্ছে না, কিন্তু প্রতিবছর কর্ম সংস্থানের পদপ্রার্থী হিসেবে প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের আগমন ঘটছে। ফলে দেশের বেকার সমস্যাকেও কমানো যাচ্ছে না।
পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যানুযায়ী দেশের প্রায় ৩.২০ কোটি শ্রমশক্তির মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি ১.২০ জনের।

বাংলাদেশ কর্মকমিশনের নিম্নোক্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে সীমিত কর্মপদের জন্য বিপুল পরিমাণ পদপ্রার্থীর বৃদ্ধির হার সম্পর্কে বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় :

সন	সাধারণ ক্যাডারে শূন্যপদ	প্রার্থীর সংখ্যা
১৯৮২	৪০৩ টি	৮০০২ জন
১৯৮৩	৬৫০ টি	২৮৫০৫ জন
১৯৮৪	৬৩৩ টি	১৩০০০ জন
১৯৮৬	৩৯৮ টি	২৮১০৪ জন
১৯৮৮	২৪৭ টি	৩১২৫১ জন

[সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ৯ই নভেম্বর '৯০]

প্রভাব :

১. অতিরিক্ত জনসংখ্যা কর্মসংস্থানের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে।
২. কর্মসংস্থানের অভাবে জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কমে যায় ফলে নতুন কোন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতেও দেরী হয়।

অনুশীলনী :

১. আপনার মতে বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা মানুষের মৌলিক চাহিদার উপর কিভাবে চাপ সৃষ্টি করছে লিখুন।

২. জনাধিক্যের চাপে কিভাবে খাদ্য সংকট আমাদের উপর প্রভাব ফেলছে বর্ণনা করুন।

সারাংশ

বস্তুতঃ বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থসামাজিক বৈষম্যমন্ডিত সামাজিক কাঠামোতে বিশেষ শ্রেণীর মৌল চাহিদা পূরণে সুযোগ থাকলেও বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌল চাহিদা পূরণে সুযোগ নেই। প্রতিবছর অধিক জনসংখ্যা যেমন অন্নবস্ত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে দেশকে চরম দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে তেমনি কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতাও এই সমস্যাকে কাটিয়ে উঠাতে কোন সাহায্যে আসছে না। অন্যদিকে দেশের জনগণের বাড়তি অংশ যেমন সঠিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেনা তেমনি তাদের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন নিয়ে আসা ব্যতীত দেশের শতকরা ৮০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

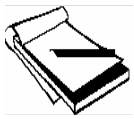

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের কত ভাগ লোকসংখ্যা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত –
   ক. ৩৪ ভাগ খ. ৪০ ভাগ
   গ. ৭৬ ভাগ ঘ. ৬০ ভাগ

২. বাংলাদেশের জনাধিক্যের চাপে মানুষের কোন্ মৌলিক চাহিদাটি শোচনীয়ভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে –
   ক. খাদ্য খ. চিকিৎসা
   গ. বাসস্থান ঘ. শিক্ষা

৩. বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখ্যার স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ কি বলে আপনি মনে করেন –
   ক. স্বাস্থ্যসচেতনহীনতা
   খ. পর্যাপ্ত সুচিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা
   গ. চিকিৎসা গ্রহণে জনসংখ্যার আর্থিক অসমর্থতা
   ঘ. সঠিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অজ্ঞতা

৪. বাংলাদেশের কোন্ মৌলিক চাহিদার অপ্রতুলতার জন্য জনসংখ্যার সার্বিক সামাজিক চাপ তৈরী হচ্ছে –
   ক. খাদ্য খ. চিকিৎসা
   গ. শিক্ষা ঘ. বাসস্থান।